জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৫ , সংখ্যা-১
জানুয়ারি-জুন ২০২৫

ISSN 2519-5816
DOI: https://doi.org/10.3329/jnujarts.v15i1.85283
Page: 1-12

মনোজ মিত্রের নাটকে প্রান্তবর্গের স্বর ও দ্রোহের স্বরূপ : *চাক ভাঙা মধু*

ড. মো. আসাদুল্লাহিল গালিব[*]

Abstract

The role and contribution of Manoj Mitra (1938–2024) in Bengali drama remain unparalleled. His plays do not merely depict stories; rather, they serve as socio-political commentaries, highlighting the struggles of marginalized communities and exposing the inherent class conflict, exploitation, and systemic oppression present in society. His deep engagement with the theatre and his experience as an actor infused his works with realism and theatrical dynamism. His dramas resonate with political awareness and social consciousness. His theatrical framework stands apart for its deep-rooted engagement with the human condition, offering profound insights into power structures, survival, and rebellion.

Among his most significant works, *Chak Bhanga Madhu* stands out as a masterpiece of social realism and class struggle. Written in 1969 and staged in 1972, this play critically examines the exploitation of the working class, highlighting their resilience and spirit of defiance. Through its characters and narrative, Mitra crafts a powerful critique of the capitalist system while simultaneously exploring the psychology of rebellion and resistance.

This article attempts to analyze *Chak Bhanga Madhu* in the broader context of socio-economic situation of our society. It delves into how Manoj Mitra conceptualized the struggle of the oppressed, how he infused his drama with artistic depth, and how his unique storytelling technique brought forth the realities of social conflict and resistance. Keeping the concept of class struggle at the forefront, this study explores how the emergence of rebellion among the exploited is dramatized in Mitra’s work. By analyzing the artistic and theatrical dimensions of *Chak Bhanga Madhu,* this article aims to highlight Mitra’s legacy as a playwright who used theatre as a means of social critique and cultural transformation.

মুখ্যশব্দ: প্রান্তবর্গ, শ্রেণিসংগ্রাম, সমাজতত্ত্ব, উপভাষা, দ্রোহের স্বর, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র।

[*] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

মনোজ মিত্রের (১৯৩৮-২০২৪) মনন ও সৃজ্যক্ষম-প্রজ্ঞা সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়– তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি কোনো তত্ত্ব দ্বারা আলোড়িত বা আরোপিত নন।[১] কেননা তিনি তীক্ষ্ণধী মানুষ হিসেবে দেখেছেন সময় ও সমাজকে। আর তাই জীবনের গভীর বোধ ও বোধির সমবায়ে গড়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টিকর্ম। মনোজ মিত্রের প্রান্তবর্গীয় জীবন অন্বেষণের দৃষ্টান্ত হিসেবে *চাক ভাঙা মধু* (১৯৬৯) নাটকটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। *চাক ভাঙা মধু* সমাজতাত্ত্বিক এবং শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাসের আলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, এ নাটকে মনোজ মিত্র এমন কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন– যাদের ভাব, ভাষা ও সংলাপ বাংলা নাটকে নতুনতর সংযোজন হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার দাবি রাখে। উল্লেখ্য যে, শ্রেণিসংগ্রামের আলোকে মনোজ মিত্র এ নাটকে ঠিক কোন ধরনের চরিত্র নির্মাণ করেছেন, তাদের মুখে কোন ধরনের ভাষা দিয়েছেন এবং তাদের উচ্চারিত সংলাপে কী রকম অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে অর্থাৎ তাদের উচ্চারণ ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটি কী – বর্তমান গবেষণায় মূলত সে বিষয়সমূহ আবিষ্কারের প্রয়াস চালানো হয়েছে। আলোচ্য 'মনোজ মিত্রের নাটকে প্রান্তবর্গের স্বর ও দ্রোহের স্বরূপ : *চাক ভাঙা মধু*' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে পাঠ বিশ্লেষণাত্মক (Content Analysis Method) গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

এক

দেশভাগের পরের প্রতিক্রিয়ার সময়টি অতিবাহিত হওয়ার পর ষাট-সত্তরের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কালপর্ব মনোজ মিত্রের নাট্যরচনার প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নাটকে সেই সময়ের অস্থিরতা ও যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বলা হয়ে থাকে– "মনোজ মিত্রের নাটক লেখার শুরু ১৯৫৯-এ *মৃত্যুর চোখে জল* দিয়ে, কিন্তু নাট্যকার হিসেবে তাঁর সত্যকার প্রতিষ্ঠা ঘটে তীব্র শ্রেণিসংঘর্ষের নাটক *চাক ভাঙা মধু*'তে।"[২] ১৯৬৯-এ রচিত এ নাটকটি নানাবিধ কারণে বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহতা লাভ করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রলেতারিয়েত এ নাটকের বিষয় ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবল প্রতাপে নিষ্পেষিত প্রান্তবর্গীয় অসহায় মানুষের আর্তির পাশাপাশি তাদের দ্রোহও ধ্বনিত হয়েছে এ নাটকে। উল্লেখ্য যে, *চাক ভাঙা মধু* নাটকে অসহায় এবং শোষক তাড়িত মানুষের দ্রোহের ভাষ্য ভিন্নতর দ্যোতনায় উপস্থাপিত হয়েছে। দেশজ নাট্যের উত্তরাধিকার প্রাধান্য পাওয়ার পাশাপাশি চরিত্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট সংলাপ এ নাটকের শিল্পসাফল্যের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। আলোচ্য নাটকের বিষয়ভাবনার কেন্দ্রে মনোযোগের আলো ফেললে দেখা যায় যে– মনোজ মিত্র ক্রোধ, প্রতিবাদ ও অসামান্য কৌতুকের সমবায়ে চরিত্রগুলোকে বাস্তব রক্তমাংসে ও সজীবতায় পুষ্ট করে অসাধারণ মানবিক নাট্যসম্ভার তৈরি করেছেন।[৩] বলে রাখা শ্রেয়– এ নাটকে ক্ষয়ে যাওয়া, পরাজিত-পদদলিত-নিষ্পেষিত মানুষের মূল্যবোধ ও মানবিক দাবিসমূহ নাট্যকারের দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে এ নাটকের অসহায় চরিত্রগুলো হারিয়ে যেতে যেতে হারিয়ে যায়নি, পরাজিত হতে হতে পরাজিত হয়নি। কেননা নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্র *চাক ভাঙা মধু*'তে যুক্তিসঙ্গত এক গভীর ভাবনাকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমরা খেয়াল করি– মনোজের নাটকে নায়ক থাকে না, বরং তারা নানামাত্রিক ঘটনার অনুষঙ্গে নায়ক হয়ে ওঠে। এরিস্টটল কথিত– নাটকের চরিত্রের যে চারটি বৈশিষ্ট্য হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো– চরিত্র হবে জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত। আমরা দেখি–

এ নাটকের চরিত্রগুলো আরোপিত বা কাল্পনিক নয়, বরং তারা সমাজের আঁকড়া বাস্তবতা থেকে ওঠে আসা এক দুঃখবহ অস্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

আলোচ্য নাটকের ঘটনাক্রম দীর্ঘ নয়, বরং সংক্ষিপ্ত। হাজার বছরের শ্রেণিসংগ্রামের পথ ধরে অসহায় প্রান্তবর্গের আখ্যানই এ নাটকের উপজীব্য। ফলে স্পষ্টভাবে এ নাটকে দুটি শ্রেণি-চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। একদল শোষক ও অন্যদল শোষিত। *চাক ভাঙা মধু*'তে শোষক অঘোর ঘোষের শাসন-শোষণ ও প্রলোভনে বন্দি গ্রামের অসহায় প্রান্তবর্গীয় মানুষ– যারা বেঁচে থাকার জন্য ধার-কর্জ ও সুদের ঘেরাটোপে আজীবন বন্দি থাকে। আর এই অঘোর ঘোষের করাল গ্রাস থেকে প্রান্তবর্গের মুক্তি পাওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টাই এ নাট্যের আখ্যান ভাবনার মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ 'উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যে বিরোধ'[৪]– মূলত তাই এ নাটকের আখ্যানের কেন্দ্রে রয়েছে।

নিগূঢ় অন্বেষণের জায়গা থেকে দেখা যায় যে– আলোচ্য নাটকে মনোজের নির্মাণ-ভাবনার অন্যতম স্বকীয়তা হলো বাস্তবধর্মী-চরিত্র সৃজন। বিশেষ করে নাট্যশিল্পের সার্থকতার মূল নিয়ামক তথা নাট্যদ্বন্দ্বকে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ কথা স্বীকার্য, একজন সচেতন নাট্যকার রাষ্ট্রীয় বাস্তবতা, সমাজচিত্র এবং এর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে কোনভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। বরং এর শিল্পসম্মত প্রকাশ ও বিকাশের দ্বারাই ঘটে তাঁর শিল্পভাবনার ঋদ্ধি।[৫] মনোজ মিত্রের *চাক ভাঙা মধু* নাটকে এ ভাবনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের দিকে তাকালে গ্রীসের নাট্যভাবনায় আমরা দুটি শব্দকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখি– এর একটি হলো Protagonist বা নায়ক আর অন্যটি হলো Antagonist বা খলনায়ক।[৬] এই নায়ক এবং খলনায়কের দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে *চাক ভাঙা মধু* নাটকের চরিত্রসম্ভারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে- মাতলা, জটা, ফুকনা প্রমুখ চরিত্রগুলো। এ নাটকে এরা সকলেই Protagonist বা নায়ক চরিত্র, কেননা এদের সকলের অবস্থান Antagonist বা খলনায়ক শোষক অঘোরের বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে একমাত্র বাদামী চরিত্রটি তার স্বকীয় সত্তা নিয়ে এ নাটকে ভিন্নতর আসনে অধিষ্ঠিত হয়। প্রান্তবর্গীয় এ সকল চরিত্রের ভাব, ভাষা, সংলাপ তথা তাদের দ্রোহের সামগ্রিক রূপের স্বরূপ তুলে ধরাই এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

দুই

চাক ভাঙা মধু নাটকের দৃশ্যপট উন্মোচনের পরপরই প্রান্তিক একটি পরিবারের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে। যাদের খাবার জোগাড়ই জীবনের প্রধানতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। পিতা মাতলা গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষারত ক্ষুর্ধাত অন্তঃসত্ত্বা কন্যা বাদামীর সামনে একটি কলস বাড়িয়ে ধরে। কলসভর্তি মধু মনে করে এগিয়ে যায় বাদামী, কিন্তু কলসের মুখ খুলতেই ক্রুদ্ধ ফনা তুলে এগিয়ে আসে একটি গোক্ষুর সাপ। কন্যার ভয়ার্ত চেহারা দেখেও সাপুড়ে মাতলার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয় না। কন্যা বাদামী ও কাকা জটার সামনে মাতলার এই কৌতুকের মধ্য দিয়ে একটি পরিহাস ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে খাবারের অন্বেষণে গিয়ে খাবার না পেয়ে সাপ ধরে নিয়ে আসার কারণ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে মাতলার নিম্নোক্ত সংলাপসমূহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে–

> মাতলা ॥ ওটারে আমি পোষ মানাবো।
> বাদামী ॥ পোষ!
> মাতলা ॥ হাঁ পোষ! বিষ দাঁত ছোটাবো না... গায়ে পা চাপায়ে উয়ার আমি ত্যাজ বাড়াবো [...]

> বাদামী ॥ এই এত্তোখানি ছোবল তুলেছে আমার দিকি!
> মাতলা ॥ আরো এত্তোখানি তোলাবো। তারপর মরার কালে উয়ারে আমি ছুঁড়ে মেরে যাবো পিথিবীর বুকি! যতো বজ্জাতে মিলে আমার যে সব্বোনাশ করেছে।[৭]

মাতলার এই সংলাপের মধ্য দিয়ে বাড়িতে সাপ ধরে নিয়ে আসার বিদ্রূপ স্পষ্ট হয়। এবং এই সংলাপের সূত্রেই এই বোধের জন্ম হয় যে– মানুষ কতটা অসহায় ও ক্ষুব্ধ হলে গোটা পৃথিবীর দিকে বিষাক্ত সাপ ছুঁড়ে দিতে চায়। অর্থাৎ যে পৃথিবী তার খোঁজ নেয় না, দুবেলা দুমুঠো খাবারের জোগাড় করতে গেলে যে পৃথিবী পাহাড়সম বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে পৃথিবীর দিকে সাপ ছুঁড়ে মারার ঘোষণার মধ্য দিয়ে মাতলার সূত্রে প্রলেতারিয়েতের দ্রোহী-সত্তারই প্রকাশ ঘটে। এর কার্যকারণ আবিষ্কার করতে শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়–

> সমবণ্টনের সুযোগ নষ্ট হওয়ার ফলেই অধিকাংশের ওপর অল্পের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করার পরও এই সমাজের প্রতিটি শিশুই আটকে পড়ে শোষণের সহস্রজালে। জীবনের পথে সে যতই এগোয়, বন্ধন ততই তীব্রতা পায়। বিরূপ বিশ্বের প্রভাবে তার ব্যক্তিত্ব হয় খণ্ডিত, প্রতিভা থাকে অবিকশিত, মানবীয় সৌরভ প্রকাশের পথ না পেয়ে গুমরে গুমরে কাঁদে।[৮]

আলোচ্য নাটকে এই ক্রন্দন দেখা যায় মাতলার মধ্যে। তাই সে মনে করে তার জীবন মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপের মতো এবং প্রচণ্ড ক্ষোভ থেকে এ কথা স্বীকার করতেও সে দ্বিধাবোধ করে না। তাই কন্যা বাদামী বারবার অভাবের প্রসঙ্গ আনলে একপ্রকার খেদোক্তি নিয়ে মাতলা বলে ওঠে– "দেখতে পাসনে আমার অবস্থা! বুকির পরে ভর দে ঘষটে ঘষটে চলিছি এট্টা সরিস্রেপের মতো।"[৯] আলোচ্য নাটকে এমন তীক্ষ্ণ ও তীর্যক যাতনাময় সংলাপের মধ্য দিয়ে নিত্যদিনের যাপিত জীবনে বাদামীর বাবা মাতলার দুর্যোগপূর্ণ অসহায় অবস্থা স্পষ্ট হয়। মাতলাদের এই অসহায়ত্ব মনোজ মেনে নিতে পারেন না। তাই তিনি তার এ সৃষ্টকর্মে এক প্রতিবাদ জারি রেখে প্রান্তবর্গের সারথি হয়ে ওঠেন। *চাক ভাঙা মধু* নাটকের আখ্যান ভাবনায় মনোজের সেই দরদি মন ও তীক্ষ্ণধী মননের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিন

চাক ভাঙা মধু নাটকে মাতলা-বাদামী-জটা তথা প্রান্তবর্গীয় এই মানুষগুলো তাদের নিত্যদিনের অভাব-অনটনের জীবনে অকস্মাৎ এক বিস্ময়পূর্ণ ঘটনার মুখোমুখি হয়। মূলত সেই ঘটনাকেই উপজীব্য করে এগিয়ে যায় এ নাটকের মূল আখ্যান। মাতলা ও তার পরিবার যখন ক্ষুধার জ্বালায় ব্যাকুল, ঠিক তখনই তারা জানতে পারে মহাজন অঘোর ঘোষকে সাপে কেটেছে। এই সংবাদ প্রাপ্তিতে গ্রামবাসীদের মতো মাতলাদের পরিবারেও স্বস্তির হাওয়া বয়ে যায়। সেই স্বস্তির স্বরূপটি ফুটে ওঠে বৃদ্ধ জটার এই অভিব্যক্তিতে–

> অরে তোর অঘোর ঘোষের ক্যাঁথায় আগুন! সে যে মরে যাচ্ছে...তারে আর কুনোদিন সুদির তাগেদায় আসতি হবে লা! মরে যাচ্ছে! আর কুনো ভয় নাই। [...] মরলি বেঁচে যাই। আমার কাছে পাঁচ কুড়ি টাকা পেতোরে। [...] ইবার যে লেচে লেচে বেঁচে থাকবো রে! আহা মুশকিল আসান করে পীর গাজী গো... আহা মুশকিল আসান করে![১০]

জটার এ সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা অঘোর নামের সেই মহাজনের অস্তিত্বের স্বরূপ ফুটে ওঠে। ফলে শোষকের সম্ভাব্য পতনের সংবাদে একটু স্বাধীন জীবনের প্রত্যাশাজনিত উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হয় জটার সংলাপে। জটার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলের মতো বাদামীর পিতা মাতলাও উচ্ছ্বসিত হয়। কিন্তু একজন মৃত পথযাত্রী মানুষকে নিয়ে এ উল্লাস বাদামী

মেনে নিতে পারে না। সকলের উদ্দেশ্যে সে বলে ওঠে– " তোমরা মানুষ না আর কিছু.."[১১] – এ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে আলোচ্য নাটকে বাদামী চরিত্রের মানবিকতা ও মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় প্রকাশ পায়। অচিরেই বাবা ও দাদুর সঙ্গে অঘোর ঘোষকে কেন্দ্র করে বাদামীর চিন্তা ও মতের পার্থক্য দেখা দেয়। অঘোরের সম্ভাব্য মৃত্যুকে সামনে রেখে ঠিক এ পর্যায় থেকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টাকে উপলক্ষ করে বাদামীর সঙ্গে মাতলা ও জটার দ্বৈরথ দেখা দেয়। এই দ্বৈরথ শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বহীন মানুষের অস্তিত্বের লড়াইকে স্পষ্ট করে তোলে। আলোচ্য নাটকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের বহুরৈখিক রূপকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে– বাদামীর মাতৃত্বের লড়াই, মাতলা-জটার প্রতিশোধস্পৃহার লড়াই, শোষকশ্রেণির শেকড় বিস্তৃতির স্পৃহা ও প্রান্তবর্গের অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চরিত্রসমূহের নিজস্ব স্বর ও দ্রোহের স্বরূপ ফুটে ওঠে। আলোচনার এ পর্যায়ে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের সূত্রে প্রান্তবর্গের নিজস্ব স্বর ও দ্রোহের স্বরূপ চিহ্নায়ন ও বিশ্লেষণের প্রয়াস দেখানো হলো।

চার

বাদামীর মাতৃত্বের লড়াই

চাক ভাঙা মধু নাটকে দেখা যায় ওঝা হিসেবে মাতলার সুনাম সর্বদিকে। তাই সাপে কাটা অঘোরকে নিয়ে মাতলার দ্বারস্থ হয় অঘোরের পরিবার। নিরূপায় হয়ে অঘোরের পুত্র শঙ্কর ও দিদি দাক্ষায়ণী মাতালাদের বাড়িতে নিয়ে আসে সাপে কাটা অঘোরকে। সে সময় চিকিৎসা তথা ওঝাগিরি না করে পালিয়ে যেতে চায় মাতলা। কিন্তু প্রতিবাদ করে বাদামী। সে চায় অঘোরের চিকিৎসা হোক। এর মধ্যে অবশ্য কিছুটা সংস্কারও বাদামীকে প্রভাবিত করে এই অর্থে যে– উঠোনে সাপে-কাটা শরীর যদি আসে ওঝাকে তা ঝাড়তেই হবে, সাপের বিষ নামাতেই হবে। এ হল মনসা দেবীর কাছে ওঝার এক প্রকার দায়। ফলে বাদামী সাপের বিষ নামানোর অনুরোধ করে যায়। পিতা মাতলাকে বাদামীর বারংবার অনুরাধ করার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়– দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের যাতাকলে পিষ্ট হওয়া প্রতিদিনকার দাহ থেকে কিছুটা মুক্তির নিমিত্তে এ উপলক্ষকে ভেস্তে দিতে চায় না নিরুপায় বাদামী। পিতা মাতলার উদ্দেশ্যে তাই সে বলে ওঠে–

> মাথা গরম করো না বাপ! সামনে তোমার এখন অনেক খরচ। [...] তোমার ঘরে এট্টা নতুন মানুষ আসতি চলেছে, ভুলে গেলে তার কথা! ট্যাকা লাগবে না? যা কই শোনো, কত্তারে বাঁচাতি পারলে যা চাই আমাদের তাই পাওয়া যাবে, যত্তো টাকা লাগে তোমার বাপ![১২]

বাদামীর এই সংলাপের সূত্রে একদিকে দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে নির্বাসিত একজন নারী হিসেবে অনাগত সন্তানের জন্য সুগভীর দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে তাঁর মাতৃরূপটি প্রবল হয়ে ওঠে। সেই সূত্রে অঘোরকে বাঁচানোর জন্য তার আবেদনের মধ্য দিয়ে বাদামীর মানবিক সত্তাটিও উপেক্ষিত থাকে না। তবে বাদামীর সকল প্রকার মানবিক আচরণের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে তার মাতৃসত্তা। এ কথা স্বীকার্য যে, নারী জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাফল্য সন্তানের জননী হওয়া। ফলে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নারী চায় মা হতে। কিন্তু অভাব–অনটনে অনেকেরই সকল স্বাদ-আহ্লাদ পূরণ হয় না। সে কারণে বহু প্রান্তিক নারী গর্ভের সন্তানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করতে দ্বিধা করে না। সে জায়গায় অনাগত সন্তানের জন্য বাদামীর দরদ এবং তাকে রক্ষার জন্য তার যাবতীয় কষ্ট ও প্রতিবাদের স্বরূপটি আলোচ্য নাটকে ফুটে ওঠে বাদামীর নিম্নোক্ত সংলাপ ও প্রতিক্রিয়ায়–

বাদামী॥ শব্দ নেই কেনে, লড়ন নেই কেনে, মাথা কই রে...মাথা!
[এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে। তীব্র যন্ত্রণা ফুটে ওঠে সর্বাঙ্গে। দম বন্ধ, চারিদিকে সব শব্দ বন্ধ। বাদামী গলার মাদুলিটা একহাতে চেপে দাঁড়িয়ে নীরবে যন্ত্রণা পোহায়। তারপর হঠাৎ দম ছাড়ে, হঠাৎ শব্দরাও হুমড়ি খেয়ে পড়ে।]
লড়েছে! রাক্কোস লড়েছে! এই যে! কী ভয় দেখালো রে! (পেটের ভেতর যেন তাকে কেউ লাথি মারছে, যন্ত্রণাবিদ্ধ আনন্দে) মার্ মার্ লাথি... যে তোরে মর বলছে তারে তুই মার! আরো মার্! আরো..![১৩]

এখানে অনাগত সন্তানের জন্য মা হিসেবে বাদামীর উপলব্ধির স্বরূপটিই তার চরিত্রটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। সেই সাথে এ অংশে নাট্যকার মনোজ মিত্রের পর্যবেক্ষণ ও জীবনদর্শন অসাধারণ শিল্প হয়ে ফুটে ওঠে। মাতৃসত্তার এই প্রবল প্রতাপ ও সয়ে যাওয়া যন্ত্রণার ভার বইতে গিয়েই বাদামী পারিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফলে সে তার অনাগত সন্তানের কথা চিন্তা করে অর্থ প্রাপ্তির আশায় ঘোষণা দেয়–

[...] আমি তারে আজ বাঁচাবো! [...] মনে ভেবেছো কি, তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই তারে বাঁচানোর? ভেবোছি কি তোমরা, আমি জানিনে ঝাড়ন? চিনিনে ওষুধ? [...] আমি তারে ইখানে ডেকেছি, আমি উয়ারে ফেরাতি পারবো না।[১৪]

সন্তান-বাৎসল্যকে সামনে রেখে বাদামীর এই প্রত্যয় দীপ্ত উচ্চারণই তাকে মাতৃসম রূপের পাশাপাশি মানবিক সত্তায় রূপান্তরিত করে। এ ক্ষেত্রে বাদামী যেমন তার নিজের অনাগত সন্তানের জন্য গভীর মমত্ব অনুভব করে, তেমনি অঘোর চরিত্রটি শোষক হলেও একজন সাপে কাটা রোগী হিসেবে বাদামীর কাছে মানবিক সেবাটুকু পাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে আলোচ্য নাটকের মধ্য পর্ব পর্যন্ত বাদামী চরিত্রটিতে তার মাতৃসত্তা ও মানবিক সত্তা যুগপৎ আলো নিয়ে উদ্ভাসিত হতে থাকে।

মাতলা-জটার প্রতিশোধ-স্পৃহার লড়াই

সাপে কাটা অঘোর ঘোষকে কেন্দ্র করে বাদামীর মাতৃসত্তা কিংবা মানবিক সত্তার সনির্বন্ধ অনুরোধের বিপরীতে মাতলা ও জটার দ্রোহী-প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করা যায় না। একজন শোষকের আসন্ন মৃত্যু কেন তাদের স্বস্তি দেয়, কেন তাদের মধ্যে প্রতিশোধ-স্পৃহা দেখা দেয় কিংবা শোষকের চিকিৎসার অনুরোধ এলে কেন তারা পালিয়ে যেতে চায়– এ সকল প্রশ্ন এ নাটকের বিষয়ভাবনার কেন্দ্রে অবস্থান করে। এ সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অঘোর চরিত্রটির নির্যাতনের স্বরূপটি স্পষ্ট করা জরুরি হয়ে পড়ে। অঘোরের নির্যাতন ও শোষণের চিত্র এ নাটকে বিধৃত হয়েছে বাদামী, জটা ও মাতলার নিম্নোক্ত সংলাপে–

জটা ॥ কখন? কখন করলাম রে কেচ্চা? আমরা তো ঝাড়নের ওষুধ গোছাতি গোছাতি খুড়ো-ভাইপোয় দুঃখির কথা বলিরে লাতিনী..
বাদামী ॥ দুঃখির কথা বলো?
মাতলা ॥ হাঁ বলি, বলি দুঃখির কথা! কেনে যখন সুদির বদলি জমিখান লিখে ন্যায়...
জটা ॥ বাসনকোসন বিছানা মাদুর টেনে ঘরদোর ফর্সা করে দেয়... পেছনের কাপড় তুলে ঠ্যাঙায়...
মাতলা ॥ তখন মানুষের কষ্ট হয় না? দুঃখ হয় না? বেদনা হয় না?
জটা ॥ আমরা তো সেইসব বেদনার কথা কইরে লাতিনী![১৫]

এ দুঃখ গাথাই ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে মাতলাদের মতো পরিবারগুলোতে। যারা সর্বাংশেই নির্যাতিত ও প্রতারিত অঘোরদের মত শোষকদের দ্বারা। তাদের এ দুঃখগাথা নতুন কিছু নয়।

ইতিহাস অন্বেষণে দেখা যায়– সেই প্রাচীনকাল তথা বৈদিক যুগে যখন রাজতন্ত্র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সমাজের বুনিয়াদ হয়ে উঠছিল– ঠিক তখন থেকেই নিরন্ন মানুষের অসহায়ত্বের শুরু।[১৬] জটা-মাতলার উপর্যুক্ত সংলাপে তাই ধ্বনিত হয়েছে নিঃস্ব হওয়ার ইতিবৃত্ত, উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণা। মূলত সেই দুঃখ ও দাহ থেকেই তারা প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে ওঠে। ফলে প্রাসঙ্গিক কারণেই অঘোর ও তার পরিবারের সংকটে গ্রামবাসীদের মত মাতলা-জটাকেও প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলতে দেখা যায়। যেহেতু মাতলা একজন গুণীন এবং শেষ পর্যন্ত তারই দ্বারস্থ হতে হয় অঘোরের পরিবারকে, সেকারণে কাকা জটার পরামর্শে এই শোষক পরিবারটিকে শায়েস্তা করার জন্য মাতলাকে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যারা অঘোদের ভয়ে নির্জীব সরীসৃপের ন্যায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে চলত, তারাই আজ অঘোরের পরিবারের সামনে নিজেদের গুরুত্বের স্বরূপটি তুলে ধরতে নানাভাবে সচেষ্ট থাকে। *চাক ভাঙা মধু* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে জটা-মাতলাদের আত্মগৌরব প্রকাশের সেই রূপটি নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন এভাবে–

> [উঠোনের কোণে ভাতের থালা ঘিরে ওরা তিনজন খাচ্ছে– জটা, বাদামী ও মাতলা। ডুলিটা নামানো রয়েছে। বৃদ্ধ বেহারা মাথায় হাত দিয়ে গুম হয়ে বসে। জোয়ান বেহারাটা মাতলাদের লক্ষ্য করছে। দাক্ষায়ণীর চোখে আঁচল।]
>
> মাতলা ॥ (বাদামীর হাত ধরে টেনে বসায়) বোস্ তো, খেয়ে নে!
>
> বাদাম ॥ বসে রয়েছে গো...
>
> মাতলা ॥ বসতি লাগুক ! [...]
>
> বেহারা ॥ হেই মাতলা!
>
> মাতলা ॥ দাঁড়াও গো, খেয়ে নি...
>
> বেহারা ॥ আরে ছাড়ো ছাড়ো, এখন খাওন ছাড়ো! উঠে পড়ো! আরে খাও কি সেই ইস্তক! পাতে তোমার আছে কি!
>
> [বলতে বলতে বেহারা পাতের ওপর পা তুলে ধরে। মাতলা খপ করে পাটা টেনে ধরতে বেহারা ঘোড়ার মতো লাফাতে লাফাতে পা ছাড়িয়ে একটা খিস্তি করে। জটা ও মাতলা উঠে মন্থরতর গতিতে হাতের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত চাটে। বৃদ্ধ বেহারা হাঁ করে ওদের হাত চাটা দেখে।][১৭]

উপরের দৃশ্যে মাতলা ও জটার এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তথা অঘোরের চিকিৎসা শুরু না করে এভাবে কালক্ষেপনের চেষ্টা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই উদ্দেশ্যের নিহিতার্থ হলো– যে শোষক মহাজনদের কারণে তারা ঠিক মতো খেতে পারে না, আজ সেই মহাজনদের অপেক্ষায় রেখে তারা আরাম করে খাওয়ার সাহস রাখে। এটিকে এক অর্থে– মিশে যাওয়া, ধ্বসে যাওয়া মানুষের আত্মগৌরব অর্জনের প্রচেষ্টা হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। প্রান্তবর্গীয় মানুষের এই চেষ্টা শুধু প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু অভীপ্সা নয়, বরং সাব-অলটার্নের দৃষ্টিকোণ থেকে তা আত্মগৌরবের বিষয়ও বটে। এই আত্ম-অহমকে সামনে রেখে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এই আত্মবিশ্বাস বহু বছরের শোষণের বিপরীতে তাদের রুখে দাঁড়াতে শেখায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর করে তোলে। সবকিছুর ঊর্ধ্বে যেমন তাদের টিকে থাকা তথা খাদ্য-সংস্থানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ফলে তারা প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। অর্থাৎ জটা ও মাতলা এই সিদ্ধান্তে নীত হয় যে– মহাজন যেমন তাদের বিভিন্নভাবে শোষণ ও নির্যাতন করে, তেমনি অঘোরের এই নাজুক অবস্থায় তার পরিবারের কাছ থেকে কৌশলে দুপয়সা আদায়ের বিষয়টিকে তারা একপ্রকার সুযোগ বলে মনে করে। আলোচ্য নাটকে চমৎকার রূপকের মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র জটা ও মাতলার এই অর্থ আদায়ের বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন–

মাতলা ॥ কাকা, এই ফাঁকে সরে পড়ি!
জটা ॥ আঁ!
মাতলা ॥ হাঁ হাঁ, আর না!
জটা ॥ যাবি? যাবি যদি বঁড়শি খেলবে কেডা?
মাতলা ॥ অনেক খেলা হয়েছে, আধমরা মানুষ নিয়ে আর খেলা চলে না! বুঝলে এতক্ষণ তো ধানাই পানাই করা গেছে, ইবার তো আর পথ লেই... হয় ঝাড়তি হয়, লয় ধরা পড়তি হয়!
জটা ॥ অরে লে লে তোর ভাগ বুঝে লে! ধরা পড়তি হয়! হুঁ! আরো জলের তলে তলায়ে যা, রুই কাতলার মতো খুব আস্তে আস্তে পাখলা লাচা... কোন শালী ধরে দেখি! আঁ, শওরে তো হাসপাতিলে কতো নোকে কাটা-ছেঁড়া করতিগে অক্কা পাচ্ছে, তো সে কি ডাক্তারের দোষ! আর এ তো আমরা কোন কাঁটা ছেড়াই করি নে! [...]
মাতলা ॥ তাহলি..তুমি আমারে এখন কী করতি বলো...
জটা ॥ আমি বলি, যেমন ফাঁদ পেতে আছি, তেমুন থাকি![১৮]

ফলে মাতলা ও জটাকে নানাভাবে কালক্ষেপন করতে দেখা যায়। তাদের এই কালক্ষেপন যতটা অর্থপ্রাপ্তির কৌশল হিসেবে বিবেচ্য, তারচেয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিশোধস্পৃহার অনুঘটক হিসেবে বেশি কাজ করে।

শোষকদের শিকড় বিস্তৃতির স্পৃহা এবং প্রান্তবর্গের অস্তিত্বের লড়াই

চাক ভাঙা মধু নাটকে মাতলা যতই প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষের জন্য– এ প্রত্যয় তার আচরণ ও কর্মপন্থায় দেখা যায়। তাই কন্যা বাদামীর অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারে না। নাট্য-আখ্যানে আমরা দেখি যে– বাদামীর কারণেই মাতলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঘোরকে বাঁচাতে তৎপর হয়। অর্থাৎ মাতলা অঘোরকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেয়। হাজারো দুঃখ ও যন্ত্রণার স্মৃতি পিছনে ফেলে মাতলা অঘোরকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে। এ সময় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা অঘোরের সামনে উচ্চারিত মাতলার সংলাপ সমূহে তার মানবাদী চেতনার স্বরূপটি ফুটে ওঠে–

মাতলা ॥ কত্তা, কি রকম বোঝো, ভার লাগে আর, অ্যাঁ? ... বাঘের মুখ থে আমি তোমারে টেনে লিয়ে এলোম গো! শুধোয়ে শোনো যমে-মানুষে আজ কি বিষম টানাটানি চলেছে। [...] কত্তামশাই, আজ তুমারে ঝাড়াতি, আজ নিজের বিষটাও ঝেড়ে ফেললাম!
বৃদ্ধ বেহারা ॥ তোর বিষ!
মাতলা ॥ কদ্দিন ভেবেছি তুমারে একবার বাগে পেলি হয়। তুমি আমাদের জমি লিয়েছ, মুফোতে খাটায়ে লিয়েছ... দেনার দায়ে আমার বুড়ো শুয়োরডারে চিরে ফেলে তার মাংস বিক্রি করেছ! [...] তবু তোমার দেনা মেটেনি! গাঁখানার বুকের পরে পা চাপায়ে লিত্য লতুন রক্ত টেনেছো, লিত্য লতুন দেনার জালে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে মেরেছো...মারতি মারতি কুথায় এনেছো এনেছ তুমি কত্তা, যেখান থে তেড়ে উঠে তুমারে মারতি গিয়েও...
জটা ॥ পেরানের থে বড় কিচু লেই...
মাতলা ॥ লেই! লেই! কত্তা আজ বুঝেছো ট্যাকা-পয়সা কোনোখানে তার চেয়ে বড় না। নিজের পেরান ফিরে পেয়ে, আজ বুঝতি পারো আমাদেরও পেরান আছে! কত্তা, কত্তা তুমার সাথে আপন বিষটাও ঝরে গেলো! তুমারো লবজন্ম... তো আমারও লবজন্ম![১৯]

মাতলার এ সংলাপের মধ্য দিয়ে বিভেদ ভুলে একটি সুন্দর ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। এবং এ সাম্য ও সুন্দরের আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে প্রলেতারিয়েতের পক্ষ থেকে। কিন্তু উচ্চবিত্ত তথা শোষক শ্রেণি কি আদৌ প্রান্তবর্গের এ আহ্বানের সারথি হয়? এ জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা অঘোরের আচরণ ও উচ্চারণে।

সকলেরই প্রত্যাশা ছিল নতুন জীবন ফিরে পেয়ে অঘোর অমানুষ থেকে মানুষ হিসেবে ফিরে আসবে। সেই সাথে অঘোরের এই প্রত্যাবর্তন বঞ্চিত, দরিদ্রক্লিষ্ট মাতলাদের জন্য সহায়ক হয়ে উঠবে। কিন্তু অঘোর তার এই প্রত্যাবর্তনে মানুষ নয়, বরং অসুর হয়ে ফিরে আসে। মাতলার প্রত্যাশা ছিল– অঘোর যেন বুঝতে পারে টাকা পয়সাই সব কিছু নয়। নিজের প্রাণ ফিরে পেয়ে সে যেন বুঝতে পারে গরীব-দুখি মানুষেরও প্রাণ আছে। কিন্তু প্রাণ ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঘোর স্বমূর্তিতে ফিরে আসে। সেই সঙ্গে দাক্ষায়িণী, শঙ্কর এরাও তাদের শোষক চারিত্র্য তুলে ধরতে পিছপা হয় না। বিপদ কেটে যাবার পরপরই অঘোর ও তার পরিবারের দীর্ঘদিনের চর্চিত শোষকশ্রেণিতে প্রত্যাবর্তনের চিত্রটি নাট্যকার তুলে ধরেছেন এভাবে–

> অঘোর ॥ ...কিন্তু এত সময় লাগলো কেন? [...] এখানে আনলি কেন বয়ে? ওরা আমার বাড়ি যায়নি কেন? আমার সুদ দে, টাকা দে! আমার টাকা ফাঁকি দিবি বলে তোরা আমায় মারতে গিয়েছিলি! মারবি! আমায় মারবি শয়তান! দে!
> মাতলা ॥ কি চাও কত্তা, সুদ!
> শঙ্কর ॥ (পায়ের জুতো খুলে হাতে নিয়ে গর্জে ওঠে) এই শুয়োরের বাচ্চার পা ধরতে বাকি রেখেছি শুধু!
> অঘোর ॥ (টলতে টলতে) দিবিনে! ফালল্! তোর সব নেবো...
> শঙ্কর ॥ নে, এবার নে! ঠেকা! কোন্ পিরীতের গোঁসাই আছে ডাক! কোথায় পুকনা-মুকনা ডাক! গুষ্টির তুষ্টি করি![২০]

এভাবেই অঘোর তার স্বমূর্তিতে ফিরে আসে। তবে অঘোর অতীতের সকল প্রকার নির্যাতনের ইতিহাস ছাড়িয়ে এ পর্যায়ে অসুর হয়ে উঠতে থাকে। সে হয়ে ওঠে ভয়ংকর প্রতিশোধ-পরায়ণ। তাকে বাঁচাতে দেরি হলো কেন, তাকে বাঁচানোর জন্য তার পরিবারের সদস্যদের এত অনুনয়-বিনয় করতে হয়েছিল কেন, তাকে কেন চিকিৎসা নিতে ছোটলোকদের গৃহাঙ্গনে আসতে হয়েছিল– এমনতর নানাবিধ অহমের উদগীরণে তার অত্যাচারী সামন্ততান্ত্রিক সত্তা জাগ্রত হতে থাকে। তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায় অঘোরের ধর্ষকামী মানসিকতা। যে বাদামীর কারণে সে জীবন ফিরে পায়, অন্তঃসত্ত্বা জেনেও শেষ পর্যন্ত সে বাদামীকেই তুলে নিয়ে যেতে চায় অঘোর। মাতলার কাকুতি মিনতিতেও তার মন গলে না। বিপুল ক্রোধে সে বাদামীকে দেখিয়ে আদেশ দেয়– 'ওকে ডাক! আমার কাছে দে!'[২১] মাতলার কন্যা বাদামীকে ভোগ করার এই অশ্লীল উদগ্র কামনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে অঘোর মনুষ্যত্ব বিবর্জিত পশুতে রূপান্তরিত হতে থাকে।

তবে অঘোর সৃষ্ট এমন নারকীয় পরিস্থিতিতে বাদামী কৌশলে বাঁচার পথ খোঁজে। মাতলার ধরা, হাঁড়িতে পুরে রাখা ভয়ঙ্কর সাপটাকে সে তার বাঁচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। ভীষণ পিপাসায় কাতর অঘোরের সামনে বাদামী পানির বদলে মধু দেয়ার প্রস্তাব রাখে। তাই কৌশলে তার সামনে সে মধুর হাঁড়ির বদলে সাপের হাঁড়ি মেলে ধরে– যেনো অঘোরের অপচ্ছাঁয়া চিরতরে দূর হয়ে যায়। কিন্তু নিষ্ফল হয় বাদামীর পরিকল্পনা। হাঁড়ি শূন্য, কারণ কন্যার নিরাপত্তার কথা ভেবে সাপটাকে আগেই হত্যা করে মাতলা। অমানুষ এবং শ্বাপদসদৃশ অঘোরকে হত্যার উপযুক্ত মাধ্যমটি হারিয়ে ভয়ার্ত এবং অসহায় হয়ে পড়ে বাদামী। নাটকটি এখানেই শেষ হতে পারতো কিন্তু শেষ হয় না। কেননা নাট্যকার মনোজ মিত্র বাদামীকে আরও এক পরিচয়ে অধিষ্ঠিত করতে চান। আর সেই আয়োজনটি তিনি করেন নাটকের শেষাংশে–

> বাদামীর আর্তনাদ। উন্মত্ত বাদামী ছুটে গিয়ে হতভম্ব অঘোরের হাত থেকে কলসিটা কেড়ে নিয়ে দরাম করে ফেলে ভাঙে উঠানে। গোক্ষুর... বাদামীর স্বপ্নের গোক্ষুর শুধু মৃত নয়, তার মাথাটা একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামির মতো ফুলে ফেঁপে হা-করা। আর তখন, হাসিতে কান্নায় দাবানলে জ্বলতে জ্বলতে মাতলার মেয়ে

> বাদামী ঐ মাথাটা ধরে সড় সড় করে সাপটাকে টেনে বার করে পেটের নাড়িভুঁড়ির মতো। ব্যর্থতায় অথবা ভেতরের কোন গোপনতম আনন্দে বাদামী সাপটাকে বার দুই উঠোনে আছড়ে ছুটে গিয়ে হাতে তুলে নেয় কচ্ছপধরা সড়কি। গর্জন করে ছোটে অঘোরের দিকে। অঘোর পালাতে গিয়ে দেখে গ্রামবাসীরা তকে ঘিরে ফেলেছে। অঘোর নিমেষে লাফিয়ে পড়ে আলের ওপাশে। বাদামীও আলের ওপরে উঠে সড়কি চালায় ওপাশে। [...] তৃতীয় খোঁচায় অঘোরের শেষ আর্তনাদ শোনা গেল।[২২]

এখানে আমরা দেখি অসহায়, দুর্বল ও ভীতিপ্রদ বাদামীর অন্তর্বাস্তবতার রূপান্তর। বাদামী চরিত্রটিকে নাট্যকার মনোজ মিত্র ক্ষুদ্র অবয়বে সীমায়িত করতে চাননি। বরং এ ভূমির হাজার বছরের প্রকৃত নারীসত্তায় প্রতিষ্ঠা দেন। আমরা আমাদের মঙ্গলকাব্যের ধারায় দেখি যে যিনি অন্নদা, তিনিই প্রয়োজনে দেবি চণ্ডীরূপে আর্বিভূত হন। আলোচ্য নাটকে সরল, অসহায়, সেবা-পরায়ন, মাতৃসমা বাদামী চরিত্রটিকে এভাবেই আমরা প্রয়োজনে চণ্ডীরূপ ধারণ করতে দেখি। এখানে বাদামী অনেকটা দেবী চণ্ডির মতোই অসুর বধে তৎপর হয়ে ওঠে। নাটকের অন্তিমে অঘোরের পরিণতি সম্পর্কে অজিতকুমার ঘোষের একটি মন্তব্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি জানাচ্ছেন– " অবশেষে সে তাহার প্রাপ্য শাস্তি পাইল এবং সে শাস্তি পাইল তাহারই হাতে যে তাহাকে কিছুক্ষণ আগে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল।"[২৩] এই প্রতিঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিটিই এ নাটকের আলোকোজ্জ্বল দিক। বাদামী চরিত্রের এই রূপান্তর ও পরিবর্তন আলোচ্য নাটকের নায়ক-রূপের স্বরূপ চিহ্নায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। কেননা চরিত্রের এই রূপান্তর সম্পর্কে সমালোচক জানাচ্ছেন–

> By the term chracter we mean the dominent sentements and beliefs of an individual at any given time, whereby his attitude to himself and his invironment is determined. it is abundantly clear that [...] chracter may change according to the invironment, whether temporal or spatial, in which the individual finds himself.[২৪]

চাক ভাঙা মধু নাটকের বাদামী চরিত্রের মধ্যেও এমনতর রূপান্তর ঘটেছে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া বাদামী চরিত্রটির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এই অর্থে– অন্যায় ও শোষণের বিপরীতে এখানে একমাত্র বাদামীই তৎপর হয় এবং সেই সবার আগে প্রতিঘাত করে বসে। গ্রামবাসীরা থাকলেও ঘটনার পর তারা চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়। ফলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মল্লভূমিতে তখন একা এবং একমাত্র বাদামীই থেকে যায়। আর তাই অনেকের মতো নিমজ্জিত থেকেও, ভীড়ের মধ্যে থেকে সহসা এভাবে এই একজন হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই– বাদামী এ নাটকের আলোকজ্জ্বল চরিত্র হয়ে ওঠে। এভাবেই সাধারণ প্রান্তবর্গীয় শ্রেণিচরিত্রের প্রতিনিধি বাদামী তার ক্রিয়া তথা উপর্যুক্ত ভূমিকার মধ্য দিয়ে অসাধারণ হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, শোষক অঘোর ঘোষের বিরুদ্ধে বাদামীর এই একক অথচ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া শ্রেণিসংগ্রামের মূল লক্ষ্যকে উচ্চকিত করে তোলে। তাই আমরা দেখি আলোচ্য নাটকে মনোজ মিত্র প্রান্তবর্গেরই বিজয় দেখিয়েছেন। পদদলিত নিঃশেষ হওয়া মানুষের এই ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মূলত মানবিকতার পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন।

উপসংহার

শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায় দ্বন্দ্ব হিসেবে যে কলার সৃষ্টি তার দুইপক্ষের এক পক্ষ অবশ্যই সাধারণ মানুষ। মনোজের *চাক ভাঙা মধু* নাটকে কলা হিসেবে নাট্যের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে যুক্ত তথা সম্পৃক্তকরণ তা সার্থকভাবে ঘটেছে।[২৫] এই সার্থকতা আরও বেশি বেগবান

হয়েছে প্রান্তবর্গের দ্রোহের ভাষা ব্যবহারের অনন্যতায়। নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনোজ মিত্র স্পষ্ট করে বলেছেন– 'আমাদের নাটকের অন্য নাম প্রতিবাদ, আক্রমণ।'[২৬] আর তাই প্রান্তবর্গের প্রতিবাদের স্বর নির্মাণে মনোজ কোন আরোপিত ভাষা ব্যবহার করেননি। বরং তাদের নিজস্ব ভাষাতেই তিনি প্রান্তবর্গের দ্রোহের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ফলে প্রান্তবর্গের মুখে উচ্চারিত উপভাষা *চাক ভাঙা মধু* নাটকের শিল্পসাফল্যের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ কথা স্বীকার্য যে– দেশকালবদ্ধ জীবন দেখাতে গেলে নাট্যকারকে চরিত্রের মুখে উপভাষা বসাতে হয়। কেননা উপভাষার মধ্য দিয়ে চরিত্রের ব্যক্তিগত প্রতীক, তার মাটি, গৃহস্থালি ও সমাজের নির্ভুল চিহ্ন ফুটে ওঠে।[২৭] এ কারণে মনোজ মিত্রের ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টতই দেখি যে– আঞ্চলিক ভাষা ও ঝলসানো শব্দের তীক্ষ্ণ প্রখরতা দ্বারা তিনি এ নাটকের সংলাপকে মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছেন।[২৮] মনোজ মিত্রের এই মনন ও শিল্পচৈতন্যের মাঝেই *চাক ভাঙা মধু* নাটকের শিল্পগৌরব উচ্চাসন লাভ করে।

তথ্যনির্দেশ

১ মনোজ মিত্র গণনাট্য সংঘ বা বিশেষ কোন রাজনৈতিক সংগঠন বা দল দ্বারা প্রভাবিত হননি বা তাদের উত্তরাধিকার বহন করতে চাননি। তিনি এসব থেকে দূরে থেকে নিজের স্বকীয় পথ নির্মাণে স্বচ্ছন্দবোধ করতেন। [দেখুন: কুমার রায়, *মনোজের মনোভূমি*, (কলকাতা : স্যাস, ১৯৯০), পৃ. ৩৫৪]

২ পবিত্র সরকার, *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ*, অখণ্ড সংস্করণ, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৮৩

৩ তদেব, পৃ. ২৮৪

৪ রেবতী বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, ১ম সংস্করণ, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৫২), পৃ. ৯

৫ শান্তনু কায়সার, *বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস*, (ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ১৫৩

৬ নাটক পুরোপুরি নির্ভর করে দ্বন্দ্ব বা Conflict এর উপর। এই Conflict বা Contest এর গ্রিক সমার্থক শব্দ Agon। এই Agon থেকে আমরা পেয়েছি দুটি নাম–Protagonist ও Antagonist। নাটকের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র, যার সঙ্গে সহানুভূতি সূত্রে দর্শকসাধারণ একাত্মবোধ করে সে Protagonist; দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে ক্রম-উন্মোচিত হয়। অন্যদিকে Protagonist-এর বিরুদ্ধ চরিত্র হলো Antagonist, যাকে আমরা খলনায়ক (Villain) বলে থাকি। এই– Protagonist ও Antagonist-এর সংঘাতেই তৈরি হয় নাটকের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব। [দেখুন: কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, (কলকাতা : রত্নাবলী প্রকাশন, ১৯৯৫) পৃ. ১০৮]

৭ মনোজ মিত্র, *নাটক সমগ্র-১*, (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৪), পৃ. ৯

৮ সাঈদ-উর রহমান, *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*, (ঢাকা : একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৫), পৃ. ৩

৯ মনোজ মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১০ তদেব, পৃ. ১০

১১ তদেব, পৃ. ১২

১২ তদেব, পৃ. ১৭

১৩ তদেব, পৃ. ২৩

১৪ তদেব

১৫ তদেব, পৃ. ৩২

১৬ রেবতী বর্মণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

১৭ মনোজ মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৮ তদেব, পৃ. ৩১
১৯ তদেব, পৃ. ৪৩
২০ তদেব, পৃ. ৪৪
২১ তদেব, পৃ. ৪৫
২২ তদেব, পৃ. ৪৮
২৩ অজিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, ষষ্ঠ সংস্করণ, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮), পৃ. ৪৩৪
২৪ R. G. Gordon, *Personality*, (London : Routledge and kegan Paul ltd, 1920), p. 2
২৫ শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১
২৬ মনোজ মিত্র, *বাংলা নাট্য হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ*, (কলকাতাঃ সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ৩২
২৭ পবিত্র সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫
২৮ অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪